প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের বিষয় ও পূর্বস্বীকৃতি

(Concern and presuppositions of Indian Ethics)

নীতিশাস্ত্র রচিত হয় কেন? নীতিশাস্ত্র কোন্ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে? একথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে মানুষই নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য। সেই মানুষ অপূর্ণ, নানাভাবে পথভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট। তার কারণ জীবনধারণ করলেও সেই মানুষ তার জীবনের আদর্শকে জানে না। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের কাছে জীবন শুধু ধারণ করার জন্য নয়, জীবনকে গঠন করতে হয়। জীবনকে গঠন করার জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন হয় যা নৈতিক। যে নৈতিক আদর্শের আলোকে জীবনকে সুন্দর করে তোলা যায় তা সাধারণ মানুষের অজানা। নীতিদার্শনিক নৈতিক আদর্শ নিরূপণের এই দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে যেখানেই নীতিশাস্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সেখানেই আমরা দেখি নীতিদার্শনিক এমন একটি জগৎ ও জীবন রচনা করতে আগ্রহী যা কল্যাণময়, সুন্দর। এই সুন্দর জীবন লাভের জন্য দার্শনিকরা নানা বিকল্প নৈতিক আদর্শ উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই নীতিশাস্ত্রের শেষ কাজ নয়। মানুষ এবং তার সমাজকে কিভাবে নীতিগতভাবে সুন্দর করা যায় তার পথ নির্দেশ করাই নীতিশাস্ত্রের কাজ। প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে আরম্ভ করে হব্‌স্ এবং স্পিনোজা পর্যন্ত সকল নীতিদার্শনিকই একটি ব্যবহারিক প্রশ্নকে সামনে রেখেছেন— মানুষের কিভাবে বাঁচা উচিত? কোন্ নৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে তার জীবনকে পরিচালনা করা উচিত?

এই ভাবনাই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিকদের নৈতিক চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা এখানে ভারতীয় দর্শন ও দার্শনিকের নৈতিক ভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রথমেই লক্ষ করা যেতে পারে যে পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে যে নৈতিক আদর্শ বিভিন্ন যুগে উপস্থিত করা হয়েছে তা একান্তভাবে পার্থিব এবং সেই আদর্শটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুখস্বরূপ। প্রাচীন দার্শনিক এপিকিউরাস, অ্যারিস্টিপাস এবং আধুনিক যুগের বেন্থাম ও মিল যে নৈতিক আদর্শ প্রচার করেছিলেন তা মূলত সুখবাদী। সুখই ছিল তাদের নৈতিক আদর্শ। এই সমস্ত দার্শনিকরা ছিলেন বস্তুবাদী অথবা জড়বাদী। মানবজীবন তাঁদের মতে জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জীবন এই জগতেই আরম্ভ হয় এবং এই জগতেই সমাপ্ত হয়।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র যে মানুষের পার্থিব জীবন সম্পর্কে উদাসীন ছিল তা নয়। তবে ভারতীয় দার্শনিকরা বিশ্বাস করেননি যে মানুষের জীবন এই জগতেই সমাপ্ত হয়। মানুষের একটি অপার্থিব জীবন আছে যা তার মর্ত্য জীবনের মতই সত্য। তাই মানুষের পার্থিব অস্তিত্বকে ভোগের উপকরণে সমৃদ্ধ করাই ভারতীয় নৈতিক আদর্শের লক্ষ্য ছিল না। চার্বাক ছাড়া অন্য কোন দার্শনিক সম্প্রদায় সুখভোগকে মানবজীবনের আদর্শ বলে মনে করেনি। ভোগ মানুষকে পৃথিবীর বন্ধনে আকৃষ্ট করে এবং অপার্থিব জগতে মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে। ভোগের ক্ষয় তাই ভারতীয় নীতিদর্শনের আদর্শ। চিত্তশুদ্ধিই তার প্রাথমিক উপায়।

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনে কখনও কখনও ত্যাগের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। তবে সেই ধ্বনি জটিল বিতর্কের কোলাহলে স্তিমিত হয়ে গেছে। যেমন, উপযোগবাদ বহুজনের কল্যাণের স্বার্থে ব্যক্তির কল্যাণকে উৎসর্গ করতে মানুষকে আহ্বান করেছে। সেই আহ্বানও ক্ষীণ হয়ে গেছে সমালোচনার আবর্তে।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে শুধুমাত্র কাম ও অর্থকে মানুষের পরম কাম্য বলে স্বীকার করা হয়নি। আমাদের অসংযত অর্থ ও কামের লালসাকে ধর্মের দ্বারা পরিশীলিত করে তাদের অন্য এক অপার্থিব আদর্শের সহায়ক করে তোলা হয়েছে। এই অপার্থিব আদর্শের নাম মোক্ষ। ভোগের ত্যাগ ছাড়া এই আদর্শ লাভ করা যায় না। তাই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের আদর্শ যে জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ একথা বলা যায় না।

পার্থিব জীবনের পরিশীলন অপার্থিব জীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি স্বরূপ। তাই ভারতীয় নীতিদর্শনিকরা মানুষের চারিত্রিক উন্নতির জন্য নানা অনুশাসনের উল্লেখ করেছেন যা তার চিত্তশুদ্ধি করবে। বৌদ্ধ দর্শনে আত্মশুদ্ধির জন্য নিরাসক্তি, সর্বজীবে প্রেম, সততা, প্রভৃতি সাধন মার্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এই দর্শনে যে শীলপালনের উপদেশ আছে তা প্রকৃতপক্ষে চরিত্র গঠনের নির্দেশ ছাড়া কিছু নয়। এই সমস্ত নির্দেশই নৈতিক নির্দেশ। 'শীল' শব্দের অর্থ সদাচার বা নৈতিক আচরণ। সর্ববিধ পাপকর্ম থেকে বিরত থাকাই শীল। বৌদ্ধদর্শনে শীলপালনের নির্দেশ

শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের জন্য নয়, সাধারণ গৃহস্থদের জন্যও এই দর্শনে পঞ্চশীল পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জৈনদর্শনেও আমরা দেখি ভোগসর্বস্ব জীবনের প্রতি অনীহা। ত্যাগ এবং অহিংসা মানুষকে নির্মোহ ও শুদ্ধ করে। আসলে চরিত্র গঠনের জন্য যে সমস্ত সংযমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মূলে আছে একটি পরম নৈতিক আদর্শ যার নাম অহিংসা। অহিংসা থেকেই বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি প্রেমের জন্ম হয়। অহিংসা মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধ দর্শনের 'ব্রহ্মবিহার' নামক তত্ত্বে মৈত্রী ও করুণার বাণী প্রচারিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে বহুজনের হিতসাধনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করাই প্রকৃত জীবনাদর্শ। তার জন্য চাই অহিংসা ও আত্মত্যাগ।

জগতে মানুষের চারিত্রিক শুদ্ধতা শুধু যে একটি সুন্দর কল্যাণময় সমাজগঠনের সহায়ক হয় তা নয়। এই চিত্তশুদ্ধি মানুষকে তার অতিজাগতিক আদর্শে নিয়ে যায়। মোক্ষই পরম পুরুষার্থ, মানুষের পরম নৈতিক আদর্শ। মানুষকে এই অপার্থিব মূল্যে অভিষিক্ত করার জন্য ভারতীয় নীতিদর্শন সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। ভারতীয় দর্শনের নৈতিক ভাবনায় এইভাবে একদিকে নৈতিক সমাজ এবং অন্যদিকে মুক্তির ধারণা প্রকট হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের নানা পূর্বস্বীকৃতির মধ্যে এই নৈতিক ভাবনার ভিত্তিকে আবিষ্কার করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনে কোন কোন পূর্বস্বীকৃতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। কান্ট তাঁর নীতিদর্শনে মানুষের অমরত্ব, ঈশ্বর ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে নীতিশাস্ত্রের পূর্বস্বীকৃতিরূপে উল্লেখ করেছিলেন। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মের মূল্যায়ন করা হয়েছে নানা আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কেবলমাত্র সকাম কর্মই যে নৈতিক মূল্যায়নের বিষয় একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ধারণা যে ভারতীয় নীতিদর্শনেও ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া অধিকাংশ সম্প্রদায় কর্মবাদে বিশ্বাসী। মানুষের সমস্ত কর্মই তার ফল দান করে— এই ধারণা প্রায় সকল দর্শনেই স্বীকৃত হয়েছে। এই কর্মনিয়ম অমোঘ। কোন কোন দর্শনে ঈশ্বরকে কর্ম নিয়মের নিয়ন্তা বলা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে কর্মনিয়মকে স্বাধীন বলা হয়েছে অর্থাৎ ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কর্ম তার ফল দান করে। তাই ঈশ্বরকে নৈতিকতার সর্বজনগ্রাহ্য পূর্বস্বীকৃতি বলা যায় না। ভারতীয় দর্শন আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু তাকে কখনও নৈতিকতার পূর্বস্বীকৃতি বলা হয়নি।

গভীরভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদ, অথবা আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদ স্বীকার করার উপর ভারতীয় নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। পার্থিব কোন কিছুই নৈতিক মূল্যবান নয়, কারণ তা অনিত্য। যা অনিত্য তা কখনও কাম্য হতে পারে না। নৈতিক আদর্শকে এই জন্য

একটি পারমার্থিক আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নৈতিক আদর্শরূপে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ কারণ মোক্ষ নিত্য। জীবের মোক্ষাবস্থার বিনাশ নেই।

জীব মুক্তিলাভ করে একথার অর্থ হল জীব নিজেকে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে উপলব্ধি করে। এই শুদ্ধ চৈতন্যই জীবের স্বরূপ। এই চৈতন্যকে দেহের কলুষমুক্ত করার উদ্দেশ্যে যাবতীয় নৈতিক অনুশাসনের অবতারণা করা হয়েছে। জীব আত্মস্বরূপ-এই ধারণাটিও ভারতীয় নীতিদর্শনের একটি পূর্বস্বীকৃতি। আত্মাকে অনাত্মার সর্বাবিধ কালিমা থেকে মুক্ত করে তাকে স্বস্থানে স্থাপন করাই ভারতীয় নীতিদর্শনের লক্ষ্য।

অতএব একথা সম্ভবত বলা চলে যে ভারতীয় নীতিদর্শন তার নৈতিক আদর্শের ভাবনায় মানুষকে পরাতাত্ত্বিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছে। জাগতিক সুখ এবং তার ভোগ অনিত্য বলেই এই নীতিদর্শনে চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে মানুষকে ত্যাগের পথে আহ্বান করা হয়েছে। বৌদ্ধ ও জৈন নীতিদর্শনে আত্মার বিশুদ্ধতার উল্লেখ আছে। জৈন মতে কর্মের প্রবাহ আত্মার বিশুদ্ধতাকে বিনষ্ট করে। যে কোন শারীরিক ভোগ বা আসক্তি মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে। তাই জৈনগণ কর্মের বিনাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আত্মার বিশুদ্ধতা ভারতীয় নীতিদর্শনের এক অন্যতম পূর্বস্বীকৃতি।